শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ চলচ্চিত্র

সম্পাদনা
বাঁধন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

শৈলজানন্দ ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯ মার্চ ১৯০১) বলতে গেলে যখন জনপ্রিয়তার দিক থেকে তুঙ্গে, তখনই অকস্মাৎ চলচ্চিত্রের জগতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। সেটা ১৯৩৫ সাল। তাঁর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে তারই করা চিত্রনাট্যে নির্মিত হল কালী ফিল্মস'এর ভিন্নধর্মী একটি ছবি 'পাতালপুরী'। (মুক্তির তারিখ ২৩ মার্চ ১৯৩৫) পরিচালক : কালী ফিল্মস এর প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন লেখকেরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম। সাদা-কালোয় তোলা ৩৫ মি. মিটারের নজরুলের রচনা ও সুরারোপনে নির্মিত সেই ছবিতে মোট ১৭টি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। অভিনয়াংশে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুবালা, কমলা ঝরিয়া। মায়া মুখোপাধ্যায়, পরেশ বসু ও লেখক স্বয়ং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র জগতে গল্পকার ও অভিনেতা হিসেবে লেখক শৈলজানন্দের সেই প্রথম প্রবেশ। তারপর তাঁরই কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত নিউ থিয়েটার্সের দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির নাম 'দেশের মাটি' (১৯৩৮) ও 'জীবন মরণ' (১৯৩৯)। পরিচালনায় খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক নীতিন বসু। সিনেমাপাড়ায় এই দুটি ছবিরই জয়জয়কার। দেখে শৈলজানন্দ দারুণ খুশী। সিনেমা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল 'পাতাল পুরী'র পর থেকেই। তার আগে থেকেই তিনি ছিলেন সিনেমা পত্রিকা সেকালের 'সাহানা'র সম্পাদক। তাতে সমকালীন ছবিগুলো সম্পর্কে তিনি নিয়মিত মূল্যবান আলোচনা করতেন। তা পড়েই তার সিনেমা শিল্পবিষয়ক উপলব্ধি। জ্ঞান ও বিশ্লেষণী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিউথিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ শৈলজানন্দকে সাগ্রহে নিউ থিয়েটার্সে ডেকে পাঠান। ফলে তখন থেকেই স্টুডিওপাড়ায় শুরু হল লেখক শৈলজানন্দের নিয়মিত যাতায়াত। 'দেশের মাটি' ছবি করবার সময়েই তিনি পরিচালক নীতিন বসুর সহকারী নির্বাচিত হলেন। যোগ দিলেন নিউ থিয়েটার্সে। ব্যস্ততার কারণে বাধ্য হয়ে তখন ছেড়ে দিতে হল 'সাহানা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। কয়েক বছরের মধ্যে চিত্র পরিচালনার কাজে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শৈলজানন্দ।

সম্পূর্ণ নিজের পরিচালনায় শৈলজানন্দের নির্মিত প্রথম ছবির নাম 'নন্দিনী'। নিজের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে তোলা এই ছবিটি ৮ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখে কলকাতার রূপবানী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন হিমাংশু দত্ত। গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সুবল মুখোপাধ্যায় ও প্রণব রায়। অভিনয়াংশে — অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ফণী রায়, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারানী, বিপিন গুপ্ত, পশুপতি কুন্ডু ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি সে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির

সম্মান লাভ করে। লেখক জীবন থেকে এসে জীবনের প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করলেন চিত্রপরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সেই আশ্চর্য সাফল্যের ফসল শৈলজানন্দের নিজস্ব কাহিনী ও চিত্রনাট্য অলম্বনে নির্মিত তাঁর পরিচালিত বাকি আরও পনেরোটি ছবি। যেমন — বন্দী (১৯৪২), শহর থেকে দূরে (১৯৪২), অভিনয় নয় (১৯৪৫), মানে না মানা (১৯৪৫), শ্রীদুর্গা (১৯৪৫), রায় চৌধুরী (১৯৪৭), ঘুমিয়ে আছে গ্রাম (১৯৪৮), রঙ বেরঙ (১৯৪৮), সন্ধ্যাবেলার রূপকথা (১৯৫০), একই গ্রামের ছেলে (১৯৫০), ব্লাইন্ড লেন (১৯৫৪), বাংলার নারী (১৯৫৪), মণি আর মাণিক (১৯৫৪), কথা কও (১৯৫৫) এবং আমি বড় হব (১৯৫৭)। শৈলজানন্দের নিজের কাহিনী অবলম্বনে নিজস্ব পরিচালিত অসমাপ্ত বাকি চারটি ছবির তালিকায় আছে (১) বিপর্যয়, (২) সতীন কাঁটা (৩) ষ্টেশন মাষ্টার ও (৪) শিলালিপি। এছাড়া শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে অন্যান্য পরিচালকদের নির্মিত ও মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলি হল ঃ (১) পাতাল পুরী (১৯৩৫), (২) অনাথ আশ্রম/বাংলা ও হিন্দি (১৯৩৭), (৩) দেশের মাটি/বাংলা ও হিন্দি (১৯৩৮), (৪) জীবন মরণ (১৯৩৯), (৫) ডাক্তার/বাংলা ও হিন্দি (১৯৪০), (৬) নন্দিতা (১৯৪৪), (৭) সন্ধি (১৯৪৪), (৮) শান্তি (১৯৪৬) (৯) এই তো জীবন (১৯৪৬), (১০) প্রতিমা (১৯৪৬), (১১) শৃঙ্খল (১৯৪৭), (১২) উপহার (১৯৫৫), (১৩) দুই পর্ব (১৯৬৪), (১৪) রূপ সনাতন (১৯৬৫), (১৫) জয়া (১৯৬৫), (১৬) আনন্দ আশ্রম/'ডাক্তার' অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দি (১৯৭৭), (১৭) বড় ভাই (১৯৮২), (১৮) খেলার পুতুল (১৯৮২)। অর্থাৎ শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবির সংখ্যা (অসমাপ্ত ৪টি ছবি বাদ দিলে) মোট ৩৪।

চিত্র পরিচালনার কাজে ১৭ বছর যুক্ত (১৯৪১-১৯৫৭) থেকে তিনি ১৬টি ছবির কাজ করে রূপালী পর্দার জগতে পাকাপাকি ভাবে শুধু যে নিজের স্থানটিই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের নিরিখে বলতে গেলে তিনি সমকালীন প্রায় সকলকে অতিক্রম করতেও রাতারাতি সক্ষম হয়েছিলেন বলা যায়। তাঁর পরিচালিত মাত্র ৮টি ছবির ভাগ্যেই মোট ৩৩টি পুরস্কার লাভ একালের বিচারেও যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। যেমন— নন্দিনী (৩টি পুরস্কার), বন্দী (৯টি পুরস্কার), শহর থেকে দূরে (৮টি পুরস্কার) ইত্যাদি। শৈলজানন্দের কাহিনী নির্ভর বাকি ১৮টি ছবির অর্জিত পুরস্কারের সংখ্যা মোট ১২। যেমন 'দেশের মাটি' (১৯৩৮) পরিচালক নীতিন বসু। ছবিটি ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তালিকাভুক্ত প্রথম ভারতীয় ছবির মর্যাদা লাভ করেছিল। এছাড়া, 'ডাক্তার' ছবিটি ৫টি পুরস্কার ও 'সন্ধি' মোট ৬টি পুরস্কার লাভ করে।

শৈলজানন্দের বন্ধু লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছিলেন 'শৈলজানন্দ যখন প্রথম স্টুডিও চত্বরে আসেন তদানীন্তন সিনেমার কর্মকর্তারা তাঁকে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। কিন্তু 'শহর থেকে দূরে' যখন সুপারহিট হল তখনই শৈলজানন্দের সমাদর হল, এরপর শৈলজানন্দ যে ছবিরই চিত্রনাট্য লেখেন — সেই ছবিই ব্যবসায়িক সাফল্য আনে। এর ফলে তখনকার দিনেই শৈলজানন্দের রেট ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা।' (সূত্র ঃ বাংলার চলচ্চিত্রকার — নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৭২)

ছবি তৈরী করতে গিয়ে সংগৃহীত তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনীও কম আকর্ষণীয় নয়। রূপালী পর্দার জগতে এসে রাতারাতি তিনি নিঃসন্দেহে যুগপৎ অজস্র সম্মান ও অর্থরোজগার করেছিলেন। চল্লিশের দশকেই সাগ্রহে খুলেছিলেন নিজের দুটি চিত্র প্রতিষ্ঠান Your Films

এবং 'শৈলজানন্দ চিত্র প্রতিষ্ঠান' (১৯৪৫)। 'মানে না মানা' ছবি থেকে তিনি বিপুল অর্থ লাভ করার সুবাদে সেই প্রথম বাগবাজারে প্রথম নিজের একটি বাড়ি কিনতে সক্ষম হন। তখন তিনি মোট তিনটি গাড়ির মালিক অথচ নানা কারণে আবার পঞ্চাশের মধ্যভাগে এসে তিনি রিক্ত। প্রায় সর্ব্বস্বান্ত। অভাবে তখন তিনি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। শারীরিকভাবে রোগে, শোকে জীর্ণ শৈলজানন্দ পুনরায় লেখার জগতে তখন ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ভাঙা মন আর জীর্ণ দেহ নিয়ে কম বেশি লিখে জীবনের শেষ দুই দশকের মধ্যে প্রায় বছর চারেক একটানা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাবার পর ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি ৭৬ বছর বয়সে তাঁর জীবন শিখা চিরতরে নির্বাপিত হয়।

শেষ দিকে সিনেমা বিষয়ক অজস্র রচনা লিখে গিয়েছিলেন লেখক ও চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কেবলমাত্র সিনেমার বহুবিধ অভিজ্ঞতার কথা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ রচনা 'যে কথা বলা হয়নি'। গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হবার পর (১ম সংস্করণ ১৯৬৯ প্রকাশ ভবন) চলচ্চিত্র রসিক সমাজে তা সমাদরে গৃহীত হয়। গ্রন্থটি বহুকাল ধরে পাওয়া যায়নি। অথচ পাঠক তথা চলচ্চিত্র রসিক মহলে গ্রন্থটির চাহিদা বহুকাল ধরেই ঊর্ধ্বমুখী। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং লেখক সম্পাদিত সিনেমার সাপ্তাহিক কাগজ 'সাহানা' (১৯৩২) ও 'ছায়া' (১৯৩৪) পত্রিকায় প্রকাশিত শৈলজানন্দের সিনেমা বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী মূল্যবান রচনাগুলি ছাড়াও সুধীরেন্দ্র সান্যাল ও শৈলজানন্দ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সচিত্র বায়োস্কোপ' (১৯২৯), সব্যসাচী (১৯৪০) সাপ্তাহিক 'শনিবারের ডাক' (১৯৫২) ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি বহুকাল অগ্রন্থিত থাকায় একালের চলচ্চিত্র রসিক সমাজের পাঠকের কাছে তা আজও অপরিচিত ও অধরা হয়ে আছে। বিশেষ করে, সিনেমা বিষয়ক পর্যালোচনাগুলি এবং আপন অভিজ্ঞতার চালচিত্রটি বস্তুত সেই সব রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন — আমার গল্পের প্রথম ছবি, বাংলা ছবির কারবার, ছবির কারখানা, চিত্রনাট্য, সিনেমা সংকীর্তন এবং সিনেমার গতিপথ ইত্যাদি। এছাড়া সিনেমা নিয়ে লেখা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রবন্ধের নাম — 'গল্প ও টেকনিক' এবং 'গোরা'। সর্বোপরি তাঁর সিনেমা ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত সিনেমা বিষয়ক রচনার সংকলন গ্রন্থ 'যে কথা বলা হয়নি' মূল্য আজও অপরিসীম। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবি দেখে তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি তাঁর প্রাত্যহিক দিনলিপিতে (১৯ মে ১৯৬৬) লিখে গিয়েছিলেন। এই মহৎ চলচ্চিত্র প্রতিভার বিচার সম্মিলিত সেই মূল্যায়নটি নিঃসন্দেহে সংগ্রহযোগ্য। ইতোমধ্যে তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত। এই রচনা সংকলনে লেখকের নির্বাচিত মোট সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে।

সিনেমা সম্পর্কে শৈলজানন্দের ভাবনাচিন্তা তাঁর উপলব্ধিজাত রূপরেখা গুলি একত্রে এই প্রথম সংকলন করার ক্ষেত্রে বহুজনের প্রয়াস আজ 'প্রসঙ্গ ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থের মাধ্যমে সশ্রদ্ধায় সংরক্ষিত হল। কোথাও প্রসঙ্গ ও স্মৃতিচারনায় পুনরুল্লেখও ঘটেছে।

প্রয়াত লেখকের কন্যা শ্রীমতী শ্রীপর্ণা মুখোপাধ্যায় ও দৌহিত্র শ্রীমান মিলন মুখোপাধ্যায় অনেক দিন ধরে বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে এই রচনাগুলিকে উদ্ধার করে অবশেষে জনসমক্ষে তা মেলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সেই নিরলস প্রয়াস ও স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হল।

শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও লেখক, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উৎসাহ এই গ্রন্থের প্রকাশন ও সম্পাদনাকর্মে প্রেরণা স্বরূপ। গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে আমরা কৃতার্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশনের দায়িত্ব 'পুনশ্চ' প্রকাশনের কর্ণধার শ্রীমান সন্দীপ নায়ক স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করে শৈলজানন্দ অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হলেন। তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ।

বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক সাহিত্য ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-চর্যায় প্রথম সার্থক এই রূপকার যিনি বাংলা চলচ্চিত্র জগতেও আবির্ভাবের পর থেকেই চলচ্চিত্র রসিক জনমানসে শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় সমাদৃত তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্র-কর্ম ভবিষ্যতেও আদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আজ শৈলজানন্দের ১০৪তম জন্মদিবসে তাঁর উদ্দেশে পুনরায় আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি অর্পিত হল, ১৯ মার্চ ২০০৪।

সূচিপত্র

আমার গল্পের প্রথম ছবি	❑	১৩
চিত্রনাট্য	❑	২০
হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি	❑	২৯
আউটডোর সুটিং-এর সূত্রপাত	❑	৩৪
ছবির কারখানা	❑	৩৭
সিনেমার গতিপথ	❑	৪০
যে কথা বলা হয়নি	❑	৪৪

আমার গল্পের প্রথম ছবি

সিনেমায় আমার প্রথম ছবি— (আমার গল্প, আমার চিত্রনাট্য, আমার পরিচালনা) বলতে হলে নাম করতে হয় 'নন্দিনী'র। ছবির মালিক কিন্তু অন্য লোক। তাঁর টাকা, তাঁর কোম্পানী, তাঁরই সব। আমি শুধু নগদ টাকা নিয়ে চাকরি করেছি।

স্বাধীনভাবে সিনেমা-ছবির রাজত্বে এই আমার প্রথম প্রবেশ। পরের পর অনেকগুলি ছবি আমি করেছি।

'নন্দিনী'র পর 'বন্দী, 'বন্দী'র পর 'শহর থেকে দূরে', তারপর 'মানে না মানা', 'অভিনয় নয়', 'শ্রীদুর্গা'— ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবাই ভাবতো ছবিগুলির মালিক বুঝি আমি। কিন্তু একখানি ছবিরও মালিক আমি ছিলাম না। আমার গল্প, আমার চিত্রনাট্য এবং আমার পরিচালনা। তার জন্য টাকা নিয়েছি। কাজ করেছি।

তারও আগে একখানি সিনেমা ছবির কথা না বললে চলবে না। তার গল্পটি ছিল আমার। চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা ছিল স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর। এই প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ছিলেন অধুনালুপ্ত কালী ফিল্ম স্টুডিয়োর মালিক। এখন যে স্টুডিয়োটির নাম 'টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিয়ো'— সেই স্টুডিয়োর নাম ছিল— কালী ফিল্ম স্টুডিয়ো।

এই প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে হঠাৎ একদিন একখানি চিঠি পেলাম— তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন— আমি যেন টালিগঞ্জ কালী ফিল্ম স্টুডিয়োতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি।

গেলাম দেখা করতে।

স্টুডিয়োর মালিক দেখা করতে বলেছেন— নিশ্চয়ই সিনেমা সংক্রান্ত কোনও কাজের কথা বলবেন— মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি।

সাহিত্যের গল্প নিয়েই সিনেমার ছবি তৈরী হয়। কাজেই গল্প-লেখক হয়েও সিনেমার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল প্রবল। অথচ সিনেমার ছবি কেমন করে তৈরী করতে হয় তখন তার কিছুই আমি জানতাম না। এই সুযোগে যদি জেনে নিতে পারি তো মন্দ কি?

প্রিয়নাথবাবুর নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে কোনো দিন দেখিনি তাঁকে।

সেইদিনই প্রথম দেখলাম।

চা আর চপ খাইয়ে আপ্যায়িত করলেন। সিগারেট দিলেন। তারপর কাজের কথা হলো—

ড্রয়ার টেনে বের করলেন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি দেখেই চিনলাম— 'আজকাল'।

সেই আজকাল পত্রিকায় আমার একটি বড় গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পটির নাম— 'পাতালপুরী'।

পাতালপুরী গল্পটি দেখিয়ে প্রিয়নাথবাবু বললেন, আপনার এই গল্পটি আমি নিতে চাই। সিনেমার ছবি করবো। এর জন্য আপনাকে কি দিতে হবে বলুন।

কি বলবো বুঝতে পারছি না। সিনেমা-জগতের হাল-চাল কিছুই তখন জানি না। বললাম, গল্পের জন্য যে টাকা আপনি অন্য লেখকদের দিয়ে থাকেন আমাকেও তাই দেবেন।

কি যেন ভেবে তিনি বললেন, ঠিক আছে।

দু'দিন পরে আমাকে একদিন বিকেলবেলা যেতে বললেন। এগ্রিমেন্টের কাগজপত্র আমি টাইপ করিয়ে রাখবো, আপনি সহি করে চেক নিয়ে যাবেন।

উত্তম প্রস্তাব। কত টাকা পাব জানি না, তবু আনন্দ হলো। কারণ গল্প-উপন্যাস লিখে তখনকার দিনে যে-টাকা আমি উপার্জন করতাম সে-টাকা এতই নগণ্য যে এই উপরি পাওনার প্রস্তাবটাও আমার কাছে ছিল রীতিমত আনন্দজনক।

নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে হাজির হলাম। রীতিমত ষ্ট্যাম্প-পেপারের ওপর টাইপ করা কয়েকটি কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন ভাল করে। তারপর সহি করবেন।

পড়লাম। অর্থাৎ একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এক, দুই, তিন নম্বর দিয়ে দিয়ে নানারকম শর্তের বন্ধনে আমাকে বাঁধা হয়েছে। যেমন ধরুন— এই 'পাতালপুরী' গল্পটি আমার নিজের লেখা। এই গল্পের সিনেমা-স্বত্ব বিক্রি করবার অধিকার আমার আছে। এর আগে কোনোদিন কাউকে এর সিনেমা-স্বত্ব বিক্রি করিনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর সিনেমা-স্বত্ব বিক্রি করার জন্য আমাকে দেওয়া হচ্ছে পাঁচশ' টাকা। এর চিত্রনাট্যটি আমাকেই লিখে দিতে হবে এবং যেহেতু সেটি কয়লাকুঠির গল্প— কলিয়ারীতে সুটিং করবার ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হবে। তার জন্য যা-কিছু খরচ-খরচা কোম্পানী বহন করবে।

এর চিত্রনাট্য লেখার জন্য আমাকে আরও তিনশ' টাকা দেওয়া হবে। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলেই তাঁরা আমাকে আর একটি তিনশ' টাকার চেক্ দেবেন।

কাগজপত্রে সহি করে পাঁচশ' টাকার একখানি বেয়ারার চেক্ নিয়ে আমি চলে আসছি, প্রিয়নাথবাবু আবার ডাকলেন আমাকে। বললেন, কোথায় কোন্ কলিয়ারীতে সুটিং-এর ব্যবস্থা করবেন?

রাণিগঞ্জের কাছে আমার শ্বশুরবাড়ির জোড়জানকী কলিয়ারী তখন খুব জোর চলছে। বললাম, সেইখানেই ব্যবস্থা করে দেবো।

প্রিয়নাথবাবু বললেন— তিরিশ-চল্লিশজন লোক থাকবে আমার সঙ্গে। গাড়ী থাকবে, যন্ত্রপাতি থাকবে। তাদের থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

বললাম, পারবো।

জোড়জানকী কলিয়ারীতে কাছেই ইকড়া গ্রামে আমার রাজবাড়ীর মতন বিরাট বাড়ী মস্ত

বড় এন্ট্রান্স ইস্কুল, বোর্ডিং হাউস, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, গেস্ট-হাউস ইত্যাদি অনেককিছু আছে। প্রতি বৎসর বাসন্তীপুজোর সময় কলকাতা থেকে বড় বড় নামকরা যাত্রার দল যায়। যাত্রার দলে থাকে বিস্তর লোক। তিন চারদিন তারা পরমানন্দে থাকে, খায়, যাত্রাগান করে আবার কলকাতায় ফিরে আসে। কাজেই সিনেমার ছবি তুলতে যারা যাবেন তাঁদের থাকা খাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিতে পারবো।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, আপনি কালকেই একবার সেখানে চলে যান। গিয়ে সব বলেকয়ে ঠিক করে আসুন। তারপর আপনার সিনারিও লেখা শেষ হলেই আমরা সেখানে চলে যাব।

বললাম, তাই হবে। কাল যেতে না পারি, পরশু যাব।

প্রিয়নাথবাবু তক্ষুনি তাঁর ড্রয়ার থেকে একশ' টাকার একখানি নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন আপনার যাওয়া-আসার খরচ।

—এত কেন?

—রেখে দিন। দরকার হতে পারে।

ব্যবস্থাটা আমি কলকাতায় বসেই করে দিতে পারতাম, কিন্তু টাকা যখন দিলেন তখন একবার সেখানে যেতেই-বা দোষ কি?

পরের দিনই রওনা হয়ে গেলাম।

সিনেমার ছবি তোলা তারা কখনও দেখেনি। সেই দেখার আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজী তো তারা হলোই, এমন কি বলতে লাগলো,— যত লোকই আসুন আমরা তাঁদের দুবেলা লুচি মাংস পোলাও কালিয়া খাইয়ে দেবো, পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরিয়ে দেবো, পাঁঠা কাটবো, তার জন্যে তাঁদের একটি পয়সাও দিতে হবে না।

বললাম, আপনারা খরচ করতে যাবেন কেন? কোম্পানী ছবি তৈরী করে তাই দিয়ে ব্যবসা করবে, খরচ দেবে কোম্পানী, আপনরা খরচ করবেন কেন?

তাঁরা বললেন, যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা আমাদের অতিথি। মনের আনন্দে আমরা অতিথি সৎকার করবো।

তাই করুন।

আমি কলকাতায় ফিরে এসে সেই কথা জানিয়ে দিলাম প্রিয়নাথবাবুকে।

শুনে তিনি বোধকরি খুশীই হলেন। আমাকে বললেন, এবার চিত্রনাট্য লিখুন।

অথচ চিত্রনাট্য আমি কখনও লিখিনি। সিনেমার ছবি দেখে দেখে জ্ঞান যতটুকু হয়েছে তারই ওপর নির্ভর করে লিখতে আরম্ভ করলাম। বললাম, যেমন যেমন লিখবো আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

লিখতে বেশি দেরি হলো না। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে দশ-পনেরো দিনেই শেষ করে ফেললাম।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, এবার বলুন—এ-ছবির মিউজিক ডিরেক্টার কে হতে পারে?

বললাম, হতে পারে মাত্র একজন। তার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আমার সহপাঠী বন্ধু। আমরা দুজনেই এসেছি কয়লাকুঠির দেশ থেকে।

কবি এবং সুরশিল্পী নজরুল ইসলাম তখন রীতিমত খ্যাতনামা। ভেবেছিলাম তার নাম শুনেই প্রিয়নাথবাবু তাকে চিনতে পারবেন। কিন্তু তিনি চিনলেন না। শুধু বললেন, তিনি পারবেন তো?

— বললাম, নিশ্চয়ই পারবেন।

— তা'হলে তাঁকে নিয়ে আসুন একদিন।

আমি জেদ ধরে বসলাম, নজরুল ছাড়া আমার পাতালপুরীর মিউজিক ডিরেকসান আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। সাঁওতালী গানের সুর— নজরুল যেমন জানে এমন আর কেউ জানে না। তাছাড়া কলিয়ারীর ব্যাক গ্রাউন্ড (back ground), সেখানকার atmosphere সম্পূর্ণ আলাদা। এ এক আলাদা জগৎ।

প্রিয়নাথবাবু রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর দোষ নেই। নজরুলকে তিনি একেবারে চিনতেন না।

যখন চিনলেন, স্টুডিয়োর একটি ঘরে 'পাতালপুরী'র গানের রিহার্সাল বসলো, নজরুল সেইখানে বসে বসে গান রচনা করে সাঁওতালী আর ঝুমুরের দুটি সুরের সংমিশ্রণে সে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ব সুরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলে, কাজ ফেলে দিয়ে লোকজন ছুটে আসতে লাগলো গান শোনবার জন্য, তখন দেখলাম প্রিয়নাথবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মত একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

হঠাৎ এক সময় নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কি দিতে হবে?

কি দিতে হবে— মানে কত টাকা দিতে হবে। কিন্তু নজরুল তখন গান আর গানের সুর নিয়ে মশগুল, অন্য কোনও দিকে মন দেবার অবসর নেই। হেসে বললে, কমল যে হারমোনিয়ামটা এনেছে সেটা ভাল নয়। ভাল একটি হারমোনিয়াম চাই।

কমল মানে কমল দাশগুপ্ত। সে তখন নজরুলের অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে কাজ করবার জন্যে এসেছে।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, হারমোনিয়াম কিনতে হবে?

নজরুল বললে, না না কিনতে হবে কেন? দামী কোম্পানীর হারমোনিয়াম আমি কাল নিয়ে আসবো।

ব্যবসাদার মানুষ প্রিয়নাথবাবু। তিনি যেন বেঁচে গেলেন।

পাতালপুরীর সব গান লেখা শেষ হয়ে গেল, তাদের সুর হলো! প্রত্যেকটি গান সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট মধু শীল মশাই তাঁর পোর্টেবল রেকর্ডিং মেসিনে ফিল্মের ওপর তুলে নিলেন। যে শুনলে সেই মুগ্ধ হলো। সবাই খুশী, সবাই আনন্দিত। গানের কথা এবং গানের সুর — সবই অভিনব, সবই যেন অভূতপূর্ব। সেরকম গান তার আগে কেউ কখনও শোনেনি। বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুলী-ঝুমুর হয়ে উঠলো একটি অভিনব সংযোজন।

এই সঙ্গীতাংশই হলো 'পাতালপুরী' ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কিন্তু এর জন্য নজরুল কি পেয়েছিল শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

সে অতীত ইতিহাস আপনাদের জেনে রাখা ভাল।

সব যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন প্রিয়নাথবাবু একদিন পঞ্চাশ টাকার একখানি চেক নজরুল ইসলামের নামে লিখে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন— আপনার নিজের গাড়ীতে আপনি আসা-যাওয়া করেছেন, তারই তেলের দাম দিলাম— ধরুন।

কত টাকা দিলেন তাও দেখলে না নজরুল। চেকটি পকেটে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

চেকটা তার পকেট থেকে তুলে নিয়ে আমি দেখলাম— লেখা আছে Rupees fifty only.

ভেবেছিলাম, সিনেমার একটি ছবির মিউজিক ডিরেকসানের জন্য নজরুলকে তিনি আর একটি চেক নিশ্চয়ই দেবেন।

ছবিটি রিলিজ হলো রূপবাণীতে, সবাই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগলো তার গানের আর গানের সুরের, লোকজনের মুখে-মুখে ফিরতে লাগলো সেইসব গান, কিন্তু মিউজিক ডিরেকটারকে কিছু দেবার কথা প্রিয়নাথবাবু যখন কিছুই বলছেন না, তখন আমাকেই একদিন বলতে হলো।

লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বলেই বসলাম, মিউজিক ডিরেকসনের জন্য নজরুলকে কিছু দেবেন না?

— দেওয়া তো উচিত। কিন্তু দেখছেন তো ছবিটা চললো না। আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেল।

এই বলে প্রিয়নাথবাবু আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে যা বলেছিলেন— আজও সেকথা আমার মনে আছে। বলেছিলেন, আপনার বন্ধুকে আপনি বুঝিয়ে বলবেন— তাঁকে কিছু দিতে পারছি না বলে আমি সত্যিই অত্যন্ত লজ্জিত। ছবিতে এইটিই তাঁর প্রথম কাজ। এতে তাঁর যে নাম হয়েছে সেইটিই তাঁর লাভ। আর একটি কথা তাঁকে বলে রাখবেন— এবার থেকে কালী ফিল্মস্ যে ছবি করবে সে ছবির তিনিই হবেন মিউজিক ডিরেক্টার।

নজরুলকে সেকথা বলতে হয়নি। কারণ এর জন্যে কিছু পাবার প্রত্যাশাও সে করেনি। সে চরিত্রের মানুষই সে নয়। কাজ করেই তার আনন্দ! এই পাতালপুরী ছবিতে কাজ করতে গিয়ে কয়লাকুঠির সাঁওতালী আর আমাদের দেশের প্রচলিত ঝুমুরের সুরটিকে একত্র 'পাঞ্চ' করে যে অভিনব সুরের প্রবর্তন সে করলে, তারই আনন্দে মশগুল হয়ে 'এইচ্-এম-ভি' রেকর্ডে কত গান যে সে লিখলে আর নতুন নতুন সুরের কত রেকর্ড যে বেরুলো তার সীমাসংখ্যা নির্ধারণ করা শক্ত। সে সুরের নাম হলো— নজরুল ঝুমুর।

প্রিয়নাথবাবু বলেছিলেন, কালী ফিল্মসের পরের ছবির মিউজিক ডিরেকটার হবে নজরুল। সে ছবিতে তিনি টাকার অঙ্কটা পুষিয়ে দেবেন। কিন্তু পুষিয়ে দেওয়া দূরে থাক, কালী ফিল্মসের পরবর্তী ছবি যখন হলো তখন আমাদের তিনি নামও করলেন না। না নজরুলের, না আমার।

আমাদের না ডাকবার কারণ— 'পাতালপুরী' ছবিটি ভাল চললো না।

চলবে না তা আমি জানতাম।

সিনেমার ছবি কেমন করে তুলতে হয়, সাহিত্যের গল্প কেমন করে সিনেমার ছবিতে রূপান্তরিত হয় জানতে চেয়েছিলাম আমি। শিক্ষার্থীর মত আমি গিয়েছিলাম সেখানে এর যাবতীয় টেকনিক্ শেখাবার জন্য।